Issue cover not available

Vol. 13 | No. 1 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ

Volume	13
Issue	1
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গোলাম মুরশিদ
Published online	June 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i1.3
Pages	78-115
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ

গোলাম মুরশিদ

মাইকেল মধুসূদনের জন্ম ও জীবিতকালই যে শুধু ঊনবিংশ শতাব্দী, তাই নয়; তাঁর মানসিক পরিমণ্ডলও একান্তই ঊনবিংশ শতাব্দী। এ শতাব্দীর উল্লাস, নবতর মূল্যবোধ, প্রাচীন জীবনধারণার প্রতি অবজ্ঞা এবং নবসভ্যতার গুণগুলোর মতো দোষগুলোও আত্মসাৎ করণ—সবই একাধারে মাইকেলের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। অপর পক্ষে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ও জীবিতকাল বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি বলেছেন, বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী তিনি। শুধু সমান বয়সী নন, তিনি নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর কবি। চিরকালীন মূলবোধে অবিশ্বাস, বিধাতায় অবিশ্বাস, জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনা বিশ শত মানুষকে যে নৈরাত্ম্যসিদ্ধি (negative capability) দান করেছে এবং সকল সিদ্ধি সত্ত্বেও যে মানুষ সংশয় ও সুতীব্র যুগযন্ত্রণায় আতুর, সুধীন্দ্রনাথ সেই কালের অকপট প্রতিনিধি। উনিশ-বিশে গণনীয় পার্থক্য না থাকলেও, উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যে দুস্তর ব্যবধাণ বিরাজমান। সেই সুস্পষ্ট ভেদ মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মাঝে। তথাচ মাইকেল মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়ের সাদৃশ্য কেবল দত্ত কুলোদ্ভব এইটুকুই নয়। চারিত্র ও ব্যক্তিস্বরূপে উভয়ের যে গভীরতর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তা নিতান্তই আপাত অথবা আকস্মিক নয়। শুধু এঁদের জীবনের বহিরঙ্গে নয়, অন্তর্জীবনেও এঁদের এমন কতগুলো মিল লক্ষ্যযোগ্য যে তা অমনোযোগী দর্শকের দৃষ্টিও এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি'।১ এমন কি, এ যুগে স্বভাব কবিরাও বিবেচিত নন কবি বলে। যেকালে মাইকেলের উদয় বাংলার সাহিত্যদিগন্তে, তখনো পরিশীলন, পরিমার্জনা কিংবা বড়ো রকমের প্রস্তুতির প্রয়োজন হতো না কবি বলে গণ্য হতে। আবেগের ছন্দোবদ্ধ প্রকাশই তখন কবিত্বরূপে সমাদর লাভ করতো। কবিতার পশ্চাতে অতীত সাধনা, বর্তমানের সংগ্রাম, এমন কি, ভাবীকালের জন্যে

চিন্তার খোরাক যে আবশ্যক, এটা আর যা-ই হোক, সেকালে মনে করা হতো না। একালেও বহু কবির মূলধন শুদ্ধ আবেগ। আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত সোচ্চার প্রকাশই অনেক ক্ষেত্রে বাজিমাত করতে সক্ষম হয়েছে। একালের অন্যতম জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই দলের অত্যুজ্জ্বল প্রতিনিধি! কিন্তু, ভাবতে অবাক লাগে, সওয়া শ' বছর আগে মাইকেল উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশ-বিদেশের সাহিত্য — যা প্রকৃত পক্ষে মানবসাধনার কেলাসিত রূপ — মন্থন করে অমৃত আহরণ করতে না-পারলে মাতৃভাষার দুর্বল সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই কৈশোর অবধি তিনি কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, সেই সঙ্গে স্বপ্নের বাস্তবায়ণের নিমিত্ত তিনি এ উপমহাদেশেরও য়ুরোপের বহু ভাষা শিখতে শুরু করেন এবং অধ্যয়ন করেন সেই সমস্ত ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এ রকম ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে, সে যুগে কেন এ যুগেও, অন্য কেউ কাব্যরচনায় সম্ভবত প্রবৃত্ত হননি। প্রথম জীবনে মধুসূদন মাতৃভাষার সঙ্গে অপরিচিত যদিও ছিলেন না, কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি কোনোরূপ শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, পরিপূর্ণ অশ্রদ্ধাই তিনি পোষণ করতেন। তিনি, এমন কি, মনে করতেন বাংলা ভাষা যত শীঘ্র ভুলে যাওয়া সম্ভব, ততই মঙ্গল। এ সম্বন্ধে যোগীন্দ্র-নাথ বসুর উক্তি উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে।

> ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষা অশিক্ষিতের ও বর্ব্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রের ন্যায় তাঁহারও এই সংস্কার ছিল।

বিশপ্‌স্‌ কলেজের অধ্যাপক কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ও এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> ... he never wrote anything at that time in Bengali which he affected to hold in utter contempt as a 'patois.'৩

মাতৃভাষার প্রতি মাইকেলের মনোভাব যা-ই হোক না কেন, হোমার-দান্তে-ভার্জিল-মিলটনের মতো মহাকবি হতে হলে যে বিস্তর অধ্যয়ন ও অনুশীলণের আবশ্যক তা তিনি নির্ভুলভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই বিশপস কলেজে তিনি কয়েকটি

ধ্রুপদী ভাষা শিক্ষার সুযোগ আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে

মাদ্রাজে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Captive Ladie' প্রকাশিত হওয়ার পর মাইকেল প্রশংসালাভের সঙ্গে যুগপৎ এটাও অনুভব করতে পালেন যে মাতৃভাষাই তাঁর প্রতিভা প্রকাশের যথার্থ ক্ষেত্র। একদিন কক্ষচ্যুত উল্কার মতো তাঁর যে আকস্মিক আবির্ভাব ঘটেছিল সাহিত্যাকাশে তার প্রস্তুতি তখন থেকেই আরম্ভ হয়। এই সময় মাইকেল তাঁর বন্ধু গৌরদাসকে লেখেন,

> ... Perhaps you do not know that It devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine : 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12-2 Greck, 2-5 Telegu and Samskrit, 5-7 Latine, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellisling that tongue of my fathers ?৪

একই কালে মাইকেল কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পুনরায় পড়ার জন্যে চেয়ে পাঠান গৌরদাসের কাছে। রামায়ণ-মহাভারত পরিণত বুদ্ধি নিয়ে পড়ে যে প্রেরণা তিনি লাভ করেন, তাই পরবর্তী কালে তাঁর নানা কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। তাঁর প্রাতিস্বিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে পুরাণ তাঁর হাতে সংস্কৃত হয়ে নবতর স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছিল, সে-ও তাঁর দেশবিদেশের সাহিত্যপাঠের ফলশ্রুতিস্বরূপ।

প্রথম জীবনে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা এবং পরবর্তীকালে সে ভাষায় কাব্যরচনা শুরু করার পূর্বে ব্যাপক প্রস্তুতির এই ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জীবনে। সুধীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে বাংলা দেশের বাইরে সুদূর কাশীতে মানুষ হন। 'সুধীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে বাংলা ভাষা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলো না।... কৈশোরে কলকাতায় ফিরে মাঝে-মাঝে মাতার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতেন। মাতৃভাষাকে স্বাধিকারে আনতে তাঁর যে কিছু বেশি সময় লেগেছিল তাতে অবাক হবার কিছু নেই ; যা লক্ষণীয় তা এই যে মাতৃভাষাকে স্ববশে আনবার জন্য ও নিজের কবিত্ব-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, দিনে-দিনে অনলসভাবে অনবরত তিনি "উদ্যমের ব্যথা" সহ্য করেছিলেন। তাঁর খাতাগুলিতে দেখা যায়, বাংলা ভাষার কবিতার পংক্তিকে ইংরেজি ধরণে বিশ্লেষণ করে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝে নিচ্ছেন, কোথাও দেখা যাচ্ছে পঠিতব্য পুস্তকের তালিকা, কোথাও পর পর কতগুলো মিল লিখে

রাখছেন।'[৫] এই একান্ত ছাত্রতুল্য অনুশীলন সুধীন্দ্রনাথ যখন আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। কিন্তু এই নিরন্তর সাধনার দ্বারা তিনি অল্প দিনের মধ্যেই দুর্বল ভাষাজ্ঞানকে পণ্ডিতী পরিপক্কতা দান করেন। অস্থির হস্তাক্ষর, ভারসাম্যহীন বানান, অনায়ত্ত ছন্দ, অপরিচিত শব্দরাজি অচিরেই অনুশীলনাতিরেকে বিপরীত কোটিতে উপনীত হলো। হস্তাক্ষর হলো সুশৃংখল। 'বানান ও ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁকে আমরা অভিধানের মতো ব্যবহার করেছি—আমার সমবয়সী বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যিনি উত্তর জীবনে বাংলা ও বাংলায় ব্যবহারযোগ্য প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের নির্ভুল বানান জানতেন এবং শব্দতত্ত্ব ও ছন্দঃশাস্ত্র বিষয়ে যার ধারণায় ছিলো জ্ঞানাশ্রিত স্পষ্টতা। এই শব্দের প্রেমিক শব্দকে প্রতিটি সম্ভবপর উপায়ে উপার্জন করেছিলেন; জীবনব্যাপী সেই সংসর্গ ও অনুচিন্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছিলো 'দ্বিধা-মলিদা' বা 'শুরু-অগুরু'র মতো বিস্ময়কর অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অন্ত্যানুপ্রাস'[৬] মাইকেলের দৌর্বল্য, সাধনা ও সিদ্ধির ক্রমধারা ধরেই যেন সুধীন্দ্রনাথের জীবন ও বিবর্তনের ধারা পুনরাবৃত্ত হয়েছিলো। মাইকেলের মতো সুধীন্দ্রনাথও দীর্ঘদিন (১৯২২-১৯২৯) অবিশ্রাম সাধনার ফলশ্রুতিস্বরূপ প্রথম কাব্য 'তন্বী' তুলে দিয়েছিলেন সাহিত্য রসিকদের হাতে। তিলোত্তমা, মেঘনাদবধ যেমন সুদীর্ঘ প্রস্তুতির ফল; তন্বী, অর্কেস্ট্রা তেমনি বহু অক্লান্ত, অতন্দ্র প্রহরের পুরস্কার। তাঁর বিস্ময়কর অধ্যবসায় সম্বন্ধে পুনরায় বুদ্ধদেব বসুর উক্তি উদ্ধৃত করি।

> সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে ন্যূনতম কথা এই বলা যায় যে তাঁর মতো প্রস্তুতি নিয়ে আর কেউ বংলা ভাষায় কবিতা লিখতে অগ্রসর হননি; আর অন্য একটি কথা—উচ্চতম কিনা জানি না।—যা আমরা বলতে বাধ্য, তা এই যে এক অবোধ্য, নির্বোধ ও দুঃশাসন বিশ্বের বুকে মানুষের মন কেমন করে অঙ্কিত করে দেয় তার ইচ্ছাশক্তিকে, স্থাপন করে শব্দের প্রভাবে এক শৃংখলা ও স্বার্থকতা যা একাধারে ক্ষণকালীন ও শাশ্বত—এই লোমহর্ষক প্রক্রিয়াটিকে সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি।[৭]

প্রস্তুতি ও সাধনা অত ব্যাপক ও বিশাল বলেই মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথের সিদ্ধি অত নিরঙ্কুশ। এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, এই কারণেই, উভয়ের সামান্য লক্ষণ। এই আত্মপ্রত্যয়কে কেউ কেউ, এমন কি, হয়তো অহংকার অথবা অহমিকা বলেও গণ্য করবেন।

বাংলা ভাষা ও বাংলা কবিতা মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়ের যৌবনের প্রেয়সী। প্রেয়সীকে অলংকৃত করতে গিয়ে, এই জন্যেই, কেউ কোনোরূপ বালসুলভ চপলের

পরিচয় দেননি। পরিণত দৃষ্টি ও রুচি নিয়ে উভয়ই দেশ বিদেশের সাহিত্য সিন্ধু থেকে তার যথোপযুক্ত ভূষণ অলংকার সংগ্রহ করেছিলেন। মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়ই মাতৃভাষা ব্যতিরেকে শিখেছিলেন অনেকগুলো ভাষা এবং অধ্যায়ন করেছিলেন সে-সমস্ত ভাষার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য কীর্তি। সেই সঙ্গে তুলনামূলকভাবে লক্ষ্য করেছিলেন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের দৈন্য। মাইকেল বলেছিলেন,

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।[৮]

শুধু কুনাট্য নয়, তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগই অত্যন্ত অনগ্রসর ছিলো। যে সমস্ত ধ্রুপদী সাহিত্যের সাথে মাইকেল অন্তরঙ্গ ছিলেন তাদের বিচারে বাংলা সাহিত্যের রসের স্থূলতা, আঙ্গিক ও প্রকরণের একান্ত হীনতা, তাঁর সমগ্র শিল্পী মনকে প্রবলভাবে ধিক্কার দিয়েছিলো। তাই অতঃপর তাঁর সাধনা রসের দিক দিয়ে পরিমার্জনা ও ঔদার্যের এবং প্রকরণ কৌশলের দিক দিয়ে স্থপতির। অপর পক্ষে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তও প্রত্যক্ষ করেছিলেন সমকালীন রোমানটিক কবিতার বস্তুহীন ভাবোচ্ছ্বাস এবং গঠন সৌকর্যে অতিশিথিলতা। মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো বাংলা কাব্য তখন একেবারে নুয়ে পড়েছিলো। ভাবুকতার পরিবর্তে সুবিন্যস্ত ও সংহত ভাব এবং অঙ্গবিহীন তরলতার পরিবর্তে স্থাপত্যকাঠিন্য আরোপ করে এ সাহিত্যকে যে শক্ত সমর্থ করে তোলার আবশ্যকতা ছিলো, সুধীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মাইকেলের কাল পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিমহিমা বাংলা সাহিত্যে দেখা দেয়নি ; সুধীন্দ্রনাথের কালে ভাবুকতা ও গীতলতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুনরায় প্লাবিত হয়ে গিয়েছিলো। দত্ত কবিদ্বয়, বলা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিস্বরূপ ও চারিত্র আরোপ করলেন। একজন ব্যক্তিত্বশূন্যতা পূরণ করলেন ; অন্যজন লুপ্ত ব্যক্তিত্ব পুনরুদ্ধার করলেন।

মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়ই সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ঢুঁড়ে তাঁদের কাব্যের বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও নির্মাণ কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। মধুসূদনের প্রায় সকল চরিত্র পুরাণ থেকে সংগৃহীত। কিন্তু বৃহত্তর সাহিত্য জগতের ঔদার্য তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন। নবলব্ধ তাঁর প্রশস্ত দৃষ্টি দিয়ে তিনি পুরাণকে পর্যন্ত নবীকরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ কৃতিত্ব গৌণ বাংলা সাহিত্যের রূপগত যে বিপ্লব তিনি ঘটিয়েছিলেন সে তুলনায়। বিস্মৃত কাল থেকে মঙ্গলকাব্য আর বৈষ্ণব পদাবলীর যে অর্থহীন গৌরবহীন পুণরাবৃত্তি চলে আসছিলো আর সেই সঙ্গে পয়ার-ত্রিপদী চৌপদীর দুঃসহ চর্বিত চর্বণ, মধুসূদন তাকে এক হেচঁকা টানে আধুনিকতার খরদীপ্তিতে নিয়ে এলেন। স্বাভাবিক বিবর্তনের

পথে এলে যে পরিবর্তন হয়তো হতে পারত একশ' বছরে, মাইকেলের হাতে তা ক্ষণকালের মধ্যে সম্ভব হলো। পয়ারের যতিপতনের নিয়মকে ভঙ্গ করে তাকে শুদ্ধমাত্র প্রবহমানতা দান নয়, উপরন্তু চিরকালীন লালিত অন্ত্যমিল পর্যন্ত লুপ্ত করা মাইকেলের অসম সাহসিকতা ও দ্রোহিতার পরিচায়ক। অমিত্রাক্ষর ছন্দোরচনার জন্যে মাইকেলকে যে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হয়েছিলো তা দীর্ঘ না হলেও অগভীর নয়। মাইকেল যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বাজি রেখে অমিত্রাক্ষর ছন্দে হঠাৎ একদিন তিলোত্তমা কাব্যের একটি অংশ রচনা করেছিলেন বটে ; কিন্তু তার পূর্বে 'পদ্মাবতীর' কাব্যাংশে অমিত্রাক্ষরের সকুণ্ঠ প্রয়াসই লক্ষ্যযোগ্য। আর 'তিলোত্তমায়' অমিত্রাক্ষরের যে আড়ষ্টতা কোথাও কোথাও লক্ষণীয়, 'মেঘনাদবধে' তা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে এবং বীরাঙ্গনায় অমিত্রাক্ষর স্বতঃস্ফূর্তি পেয়েছে। সমসাময়িক প্রখ্যাত কবিদের যতির আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যান্ত্রিক ছন্দের সঙ্গে তুলিত হলেই, মাইকেলের এই প্রচেষ্টা যে কত বলিষ্ঠ এবং যুগান্তকারী তা সহজেই বোঝা যায়।

যে ঈশ্বরগুপ্তের প্রশংসা করে মধুসূদন লিখেছিলেন 'কোবিদ বৈদ্য' এবং 'আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে',[৯] প্রাণময়তা ও মৌলিকতা সত্ত্বেও তাঁর ছন্দ সেই চিরানুশীলন থেকে স্বতন্ত্র নয়।

পয়ার

সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥
ধনুর তনুর শেষ, মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহা সুখ ভোগ॥
মকর সংক্রান্তি স্নানে, জন্মে মহাকল।
মকর মিতিন সই, চল্ চল্ চল্॥ (পৌষ-পার্বণ)

ত্রিপদী

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচন রচন॥ (মাতৃভাষা)

হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' মেঘনাদবধকাব্যের তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়। কাব্যের নামকরণ, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক মাইকেল তথা পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ছন্দে সেই সুপ্রাচীন এক ঘেয়েমি।

মাগো মা জন্মভূমি! আরো কত কাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবন দল বল আর কত কাল,
নিদয় নিষ্ঠুর মনে পীড়ন করিবে।

রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ও প্রধানত চিরাগত ছন্দোরীতির প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন।

আয় পুন যাই মন, করিবারে দরশন,
দর্পণ অচলে গজাননে।
যেখানে মুকুতাকারা, ঝরিতেছে জলধারা,
মহাবিনায়ক প্রস্রবণে।। (কাঞ্চীকাবেরী)

অথবা

অতুলনা রাজকন্যা, ভুবনে ভাবিনী ধন্যা,
অগ্রগণ্য রূপসী সমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ, কি বর্ণিব অপরূপ,
বর্ণিতে-বিবর্ণ বর্ণ লাজে। (পদ্মিনী-উপাখ্যান)

এই ছন্দোধারার পাশাপাশি

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে
পাঠাইলা রণে পুণঃ রক্ষঃ কুলনিধি

রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষস ভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
উর্ম্মিলা বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
(মেঘনাধবদ কাব্য, প্রথম সর্গ)

একেবারে অন্তহীন ব্যবধান রচনা করে। মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট, এমন কি প্রহসন, মধুসূদনের প্রকরণ-সচেতনারই প্রমাণক।

শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধেও মাইকেল অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সংস্কৃত ধ্বনিবহুল শব্দের আমদানি ব্যতিরেকে প্রকাশক্ষম একটি কাব্যভাষা গঠন করা সম্ভব নয়। প্রাত্যহিক ব্যবহারের ফলে আট পৌরে ভাষায় যে ম্লানতার ছাপ পড়ে শব্দের ব্যঞ্জনা যে-ভাবে লোপ পায়, সেই থেকে মধুসূদন উপলব্ধি করেছিলেন সাহিত্যের ভাষা নিত্যব্যবহার্য ভাষা হতে পৃথক হওয়া আবশ্যক।

> একদিন ... প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের সহিত বাঙ্গালা ভাষা গঠন সম্বন্ধে মধুসূদনের মহাতর্ক উপস্থিত হয়। ··· সে সময়ে সংস্কৃত রীত্যিনুসারে বাঙ্গালা ভাষা লিখনের যুগ প্রচলিত, প্যারীচাঁদ সেই 'পণ্ডিতী'-রীতির পরিবর্ত্তন ও চলিত ভাষায় পুস্তক-লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে, সহজ ভাষাতেই উক্ত পুস্তক (আলালের ঘরের দুলাল) প্রণয়নও প্রচার করিতেছিলেন। মধুসূদন প্যারীচাঁদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন?··· লোকে ঘরে আটপৌরে যা হয় পরিয়া আত্মীয়স্বজন সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে, সে বেশে যাওয়া চলেনা। 'পোষাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে। আপনি দেখিতেছি, 'পোষাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া ঘরে-বাহিরে সভা-সমাজে সর্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখন সম্ভব!' ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত ও অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেও, মধুসূদন যে বাঙ্গালা ভাষার কোনও ধার ধারেন, এরূপ ধারণা কাহারও ছিল না। তাঁহার মুখে এইরূপ শ্লেষোক্তি সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা মনে করিয়া উত্তেজিত ভাবে প্যারীচাঁদ বলিলেন, 'তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে, জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী

হইবে।' মধুসূদন তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্য-সহকারে তদুত্তরে বলিলেন, 'It is the language of fishermen, unless you import largely from Sanskrit. উহা কি আবার একটা ভাষা! দেখিবেন আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে।'[১০]

আলোচ্য উক্তি হতে সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে মাইকেলের ধারণাও বিশ্বাসের পরিচয় পাই। এই নীতিতে অবিচল থেকেই তিনি অতঃপর একটি নব্য ভাষার সৃষ্টি করেন, যা তখনো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অপ্রচলিত ছিলো। তাঁর কাব্যের বিষয়-বস্তু যে ত্রিভুবনব্যাপী, তাঁর অঙ্কিত চরিত্ররাজি যে মহিমাব্যঞ্জক, যে সুমহান ভাব উপস্থাপনের প্রচেষ্টা তাঁর, যে উদার ও শ্রেষ্ঠ রস সৃষ্টি তাঁর অভিপ্রায়, মাইকেলের সাংস্কৃতিক শব্দাক্রান্ত ভাষা তার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হয়েছিল। প্রাসাদনির্মাণে যেমন এক একখানি পাথর অথবা ইষ্টক সুবিন্যস্তভাবে সযত্নে ব্যবহৃত হয়, মাইকেল তেমনি এক একটি সুনির্বাচিত যাদুস্পর্শী শব্দ কুশলী স্থপতির মতো গেঁথে তাঁর মহাকাব্যের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব-বন্ধন সেতু; রাজ পথ-সম
প্রশস্ত; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি ঃ
কি 'সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেত ঃ! হা ধিক্, ওহে জল দলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়

তুমি? হায় এই কি তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জণবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃংখলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপথ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুব-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।'

(মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম সর্গ)

সমুদ্রের সুগম্ভীর সৌন্দর্যমণ্ডিত চিত্র অঙ্কন ও সেই সঙ্গে প্রবল শক্তিধর লঙ্কাপতির তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ এই শব্দসমূহ ব্যতীত কি করে সম্ভব হতো, জানিনে।

শব্দব্যবহারে মাইকেলের সচেতনতা এত সুপরিচিত যে অভিধানিক শব্দপ্রীতিকে মাইকেলি লক্ষণ বলে অনেকে গণ্য করেন। এই কারণেই 'শনিবারের চিঠি' মধুসূদনের সত্তর বছর পরের কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে 'হাতিবাগানের মাইকেল' বলে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাইকেলের প্রকরণ-ভাবনার সদৃশ্য শুধু আভিধানিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়। এমন কি, দুজন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন ভিন্ন কারণে। মাইকেলের কান ছিলো একান্তই সঙ্গীতধর্মী। প্রধানত সেহেতু তিনি ধ্বনিবহুল, সঙ্গীতময় ও গম্ভীর শব্দ সমূহ চয়ন করেছিলেন। অপর পক্ষে, সুধীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শব্দ অন্বেষণ করেন ভিন্ন কারণে। তিনি বলেছেন,

> শব্দের স্বভাব টাকার মতো, বহুব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জমে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থান পায় যাদু-ঘরের গ্লাসকেসে। কিন্তু ম্যুজিয়ম্‌ভুক্তি বিলপ্তির নামান্তর নয়; অপ্রচলিত শব্দও অবস্থা বিশেষে কাজে লাগে।[১১]

সুধীন্দ্রনাথ এমনি বহু ম্যুজিয়ম্‌ভুক্ত শব্দ নতুন করে প্রয়োগ করেছেন। কেননা তিনি অনুভব করেছিলেন তাঁর সূক্ষ্ম ভাববিশেষকে প্রকাশ করার বাহন হতে পারে কেবল বিশিষ্ট শব্দসমূহই। সত্যি বলতে কি, আধুনিক কবিগণ বিবেচনা করেন, দুটি শব্দ সমার্থক হতে পারে না, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ আছে, আছে বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক দ্যোতনা। কবির একান্ত প্রাতিসিক উপলব্ধিব প্রকাশ হয়তো একটি এবং একটিমাত্র শব্দই করতে পারে। 'সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়বস্তু জীবনের মৌলসত্য—প্রেম, কাল, ভগবান প্রভৃতির অনুসন্ধান।'[১২] যে প্রেম, কাল ও ভগবানের অন্বেষণ প্রয়াসী ছিলেন পূর্ববর্তী সকল দার্শনিক, কবি, শিল্পী। কিন্তু সকলের থেকে আলাদা একটি মৌলিক দৃষ্টি দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ নিশ্চয় এগুলোকে দেখেছিলেন; তাঁর সেই অদ্বিতীয় সন্দর্শনের প্রকাশ বহুব্যবহৃত ভাষা দিয়ে হতে পারে না। তাঁকে সেই কারণেই আপন কাব্যভাষা নির্মান করতে হয়েছিল। এবং তার জন্যে তাঁকে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা মন্থন করে যথোপযুক্ত শব্দরাজি আবিষ্কার করতে হয়েছিল। এমন কি, মাইকেলের মতো নতুন শব্দের উদ্‌ভাবন করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথের নামধাতু ব্যবহারে লক্ষ্যযোগ্য সাদৃশ্য।[১৩] কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, মধুসূদনের শব্দান্বেষণ প্রধানত সাঙ্গীতিক প্রয়োজনে, কিছুটা হয়তো ভাষাকে বলিষ্ঠতা ও প্রকাশ ক্ষমতা দান উপলক্ষে। অনেক সময় তিনি যথেষ্ট সচেতন না থেকেও শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, 'I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves, — words that I never thought I knew.' অপর পক্ষে, সুধীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনভাবে অনুসন্ধান করতেন তাঁর অভিপ্রেত শব্দটি।

> 'অন্ততপক্ষে নিপট নৈয়ায়িক ছাড়া আর সকলেই মানবেন যে ব্যক্তিগত অনুভূতির পাঞ্চজন্য অভিব্যক্তি বিপ্রলাপ নয়; এবং সাহিত্যে ওই অঘটন-সংঘটন মূলত বেদনা ও ভাষার সামঞ্জস্যসাপেক্ষ। বলা বাহুল্য উক্ত সমী-

> করণ একা প্রতিভার কর্ম নয়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর প্রযত্নের পুরস্কার ; এবং যাঁরা ভাবতে অভ্যস্ত যে কাব্য প্রেরণা বা অভিজ্ঞতার লীলাভূমি, তাঁদের বিচারে কলাকৌশল স্বাচ্ছন্দের জন্মশত্রু। এমন কি রবীন্দ্রনাথের মতো সাধক পুরুষও অনুরূপ বিশ্বাস ছাড়তে পারেননি। এবং একদিন 'উড়ে চলে গেছে' — এই অপরিচ্ছন্ন ক্রিয়ার 'উড্ডীন'-বিশেষণে রূপান্তরের চেষ্টায় আমাকে সারা সন্ধ্যা কাটাতে দেখে, তিনি খুশি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সাবধান ক'রেও দিয়েছিলেন যে যদি ওই ভাবে, অত আস্তে আস্তে লিখি, তবে আমার কলম অচিরেই একেবারে থেমে যাবে।[১৪]

কবির নিজের জবানি থেকে জানা যাচ্ছে শব্দ-প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর ইন্দ্রিয় কী জাগরূক, অনুসন্ধান কত সুদূরপ্রসারী, এবং সাধনা কত সুকঠোর ছিলো।

মাইকেলের প্রকরণচেতনা সেযুগে সম্পূর্ণ অদ্বয় হলেও, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা অচল। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ পূর্বসূরী হিসেবে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। এবং একা রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষা ও ছন্দকে অন্তত এক শতাব্দী অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। মাইকেলের ভাষার বুনিয়াদ যে প্রাকৃতজীবন থেকে একান্ত দূরে, এবং এই দূরত্ব তাঁর সাহিত্যকে পাঠক সাধারণের কাছে করে তুলেছিলো অনন্তরঙ্গু সুধীন্দ্রনাথ তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে লিখেছিলেন,

> মাইকেল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর করেই থামলেন, বুঝলেন না যে ভাষা প্রাকৃত না হলে, প্রকৃত কাব্য রচনা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে এ-কথা নিশ্চয় স্বীকার্য যে ভাষা সম্বন্ধে তিনি কোনও দিন ঔদাসীন্য দেখাননি। তৎকালীন পুঁথিগত বাংলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিল ; এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোষেরই শরণ নিয়ে থাকেন, তাহলে শুধু তাঁকেই একাদেশদর্শী বললে চলবে না, অসংস্কৃত বাংলার ঐকান্তিক দৈন্যও মানা চাই।'[১৫]

ভাষার দৈন্য ঘোচাতে মধুসূদন যে সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তাতে সুধীন্দ্রনাথের নীতিগত সমর্থন এখানে লক্ষ্য করার মতো। কেন না মনে মনে সুধীন্দ্রনাথ এ কথা জানতেন উপলব্ধি ও উক্তির সমীকরণে কবিকে দ্বারে দ্বারে ঘুরে প্রয়োজনীয় শব্দ-রাজি সংগ্রহ করতে হবে। —মনে মনে কথাটি অমৃতভাষণের পর্যায়ে পৌঁছলো,

প্রকৃতপক্ষে, সুধীন্দ্রনাথ তাঁর এ বিশ্বাসের কথা বহু স্থানে সোচ্চারকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

মাইকেলের মতো সুধীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে ভেঙেচুরে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। 'পরিণতিতে ছেদ ও যতির বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতির ফলে যে-ধ্বনি-গৌরব মাইকেল সৃষ্টি করেছিলেন, তাকেই সুধীন্দ্রনাথ প্রায় চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।'[১৬]

অপনীত প্রচ্ছদের তলে,
বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী
নম্রকণ্ঠে মরমী আহ্বান, জাগিল বিনম্র সুরে
কম্পিত উত্তর বেহালায় অচিরাৎ। মোর পাশে
সমাসক্ত নাগর-নাগরী সঙ্গে সঙ্গে বিকর্ষিল
ছিন্নগুণ ধনুকের মতো; গাঢ়হাস্যে প্রণয়ের
একান্ত প্রলাপ লজ্জা পেল সাধারণ্যে। আচম্বিতে
সচেতন প্রতিবেশিনীর ক্ষৌম কেশে উচ্চকিত
রতিপরিমল, পরদেশী সঙ্গীতের ঐকতান
সমর্থনে যেন, পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিল চিত্তে
অতিক্রান্ত উৎসবের বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত সম্মোহ॥

উদ্‌ধৃত 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার যতি-বিন্যাসে মুগ্ধ হয়েই বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, পয়ারে যতিপাতের কতগুলো নির্দিষ্ট স্থান আছে, তার ব্যতিক্রম হলেই কানে খটকা লাগার কথা, অথচ যেখানে তা লাগে না, যেখানে নিয়ম ভঙ্গের ফলে নতুন সুখকর ধ্বনির সৃষ্টি হয়, সেখানেই আমরা স্বীকার করি কবির অসামান্য দক্ষতা। মধুসূদনের 'অকালে'র পরে যতিপাত যে-বিস্ময়ের আন্দোলন তুলেছিলো আজও তা সম্পূর্ণ থেমে যায়নি। সুধীন্দ্রনাথ পয়ারকে ভেঙে-চুরে-মুচড়িয়ে যেমন খুশি চালিয়েছেন, চালিয়ে নিতে পেরেছেন একমাত্র প্রবহমানতার জোরে মধুসূদনেরও সেই জোরই ছিল।[১৭]

কিন্তু প্রবহমানতা সুধীন্দ্রনাথের ছন্দের এক পিঠ। অন্য পিঠে আছে যতিপতনের আত্যন্তিক নিষ্ঠা। সুধীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা এই রীতিরই সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য তাঁর মতো আঙ্গিক সচেতন দক্ষ কারিগরের পক্ষে সেইটাই হয়তো স্বাভাবিক। তিনি সুনির্বাচিত এক একটি শব্দের পর শব্দ যোজনা করে যে কাব্যপ্রসাদ নির্মাণ করেছেন তা প্রকৌশলীর সূক্ষ্ম মাপমতন; এবং নিরঙ্কুশভাবে দৃঢ়পিনদ্ধ ; কোনো শৈথিল্য,

প্রকরণের কোনো ঔদাসীন্যতাকে এলিয়ে পড়তে দেয়নি। 'আঠারো মাত্রার পয়ারে আট-দশের নিখুঁত ভাবসাম্য তিনি এমনভাবে বজায় রেখে চলেন যা হুবহু পোপ ও ড্রাইডেনের এন্টিথিসিস নির্ভর 'হিরোয়িক কাপলেটে'র কথা মনে কয়িয়ে দেয়।'[১৮]

ছন্দের ক্ষেত্রে মইকেল ও সুধীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনা করে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে উভয়ই বাংলা ছন্দের সজ্ঞান ও মহৎ শিল্পী। ছন্দের সুষমার নিমিত্ত উভয়ের যে প্রযত্ন ও অকুণ্ঠ সাধনা তা-ই তাঁদের সৃষ্টিকে রসোত্তীর্ণ করেছিলো। সঙ্গীতময় ও ব্যঞ্জনাপ্রধান সাংস্কৃতিক শব্দ, যতিস্থাপনে সুদুর্লভ কৌশল এবং সুচতুর অনুপ্রাস মিলে উভয়ের ছন্দকে কারুকার্যময় করে তুলেছিলো। কিন্তু মইকেল যেমন একটি নবছন্দের প্রবর্তক, সুধীন্দ্রনাথ সে অর্থে নতুন কোনো ছন্দের প্রর্বতনা করেননি বাংলা কাব্যক্ষেত্রে। মাইকেলের আনন্দ প্রকৃত পক্ষে প্রবহমানতায় এবং অন্ত্যমিল দূরীকরণে; সুধীন্দ্রনথের স্ফূর্তি অত্যন্ত দৃঢ়বুনুনি অন্ত্যমিল যুক্ত প্রথানুগ ছন্দোরচনায়। মধুসূদন প্রাণহীন যান্ত্রিক পয়ার-ত্রিপদীর নিগড় থেকে কাব্যকে মুক্ত করেছিলেন; সুধীন্দ্রনাথ রোমানটিকতার বন্যায় ভেসে-যাওয়া ছন্দকে পুনরায় দৃঢ়ভিত্তির পর দাঁড় করিয়েছিলেন, তথা কাব্যকে অকাল স্বাস্থ্যহানি থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ দান অতিদুর্বল বাংলা ছন্দে ক্লাসিক সংযতি আরোপ। ছন্দের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান না-হোন, সচেতন ও মনন শিল্পী।

কবিদের সম্বন্ধে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে সুসময় বিশেষে তাঁদের 'পর অনুপ্রেরণার ভূত চাপে এবং তখন তাঁরা বহুজ্ঞানলুপ্ত হয়ে যা রচনা করেন তা-ই কাব্য। রবীন্দ্রনাথের মতো সজ্ঞান সাধকও মনে করেন তাঁর ভেতরে যে 'জীবন-দেবতা' অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁরই প্রেরণা তাঁর রচনার পশ্চাতে, এমন কি, তাঁর জীবনের সকল কর্ম সকল ভাবনার পেছনে।

একি কৌতুক নিত্য নুতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ

মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীত স্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।
বলিতে ছিলাম বসি এক ধারে
আপনার কথা আপন জানারে
শুনাতে ছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত—
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।[১১]

উদ্‌ধৃতি দীর্ঘতর করা যেত; কিন্তু ইতোমধ্যে আপন সাধনা এবং সিদ্ধিকে অন্তরের গোপনপুর নিবাসী যে অনুপ্রেরণা শক্তির লীলা বলে কথিত হয়েছে, নতুন করে তার আন্তরিকতা আর বৃদ্ধি হতো না। মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথে এ এক আশ্চর্য এবং আকস্মিক যোগাযোগ যে কবিত্বের এই পয়লা নম্বরের 'গুণ'টি তাঁদের উভয়ের মধ্যে অনুপস্থিত; অন্তত তাঁরা কোথাও তা স্বীকার করেননি; তাঁদের কার্যধারাও কোন পরোক্ষ প্রমাণ হাজির করে না।

মাইকেল বাংলা সাহিত্যের মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন 'রত্নাবলী'র অনুবাদ কর্মের আকস্মিক কার্যকারণে বাধ্য হয়ে—কোনো অন্তরপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে নয়। 'শর্মিষ্ঠা' রচনায় হাত দিয়েছিলেন সেও বাংলা নাটকের শ্রীহীনতা ঘোচাবার সংকল্প নিয়ে, কোনো শিল্পদেবী ভর করবার জন্যে নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিলোত্তমা

লিখতে শুরু করেন যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বাজি ধরে—কোনরূপ আন্তরিক তাগিদ এবারেও কাজ করেনি। 'আচ্ছা, কেউ না লেখে, আমিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখবো'—মাইকেলের এই উক্তির মধ্য দিয়েই অনুপ্রেরণায় অবিশ্বাসী ও সেই সঙ্গে সাধনা ও অনুশীলনে বিশ্বাসী তাঁর কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুধীন্দ্রনাথ মাইকেলের মতের শুধু পোষাক নন, এটা হচ্ছে তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের কথা তিনি উচ্চস্বরে বার বার ঘোষণা করেছেন। 'প্রেরণাতে অলৌকিকের আভাস আছে বলে, সাহিত্য সৃষ্টির উক্ত উপকরণ আমি সাধ্যপক্ষে মানতে চাইনি, তার বদলে পাকড়ে ধরেছিলুম অভিজ্ঞতাকে। অবশ্য বর্তমানে, লেখনীর পক্ষাঘাত সত্ত্বেও, স্বপ্নাচারী পথিককে যেমন, অনুপ্রাণিত কবিকে আমি তেমনই ডরাই ; এবং কালের বৈগুণ্যে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মূল্য বাড়ছে বই কমছে না'।[২০] 'প্রেরণা-নামক দায়িত্বহীনতার' পর সুধীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিলো না, তিনি মনে করতেন 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে' কবিযশঃপ্রার্থী উপনীত হতে পারেন তাঁর কাংক্ষেয় লক্ষ্য। এ যুগে স্বভাব-কবি কথাটা প্রায় নয়, রীতিমতো নিন্দাবাচক। কোনো ঐশীশক্তির প্রভাবে মননের পরিবর্তে আবেগ আর উচ্ছ্বাসকে মূলধন করে যদি যথেচ্ছা কতগুলো সুরেলা ধ্বনির মালা গেঁথে থাকেন, সেটা বড়ো কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারেনা। জীবন ও জগৎকে উপলব্ধি করার জন্যে কার প্রযত্ন কত ব্যাপক, জ্ঞানের সাধনায় নিষ্ঠা কত গভীর স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে পাঞ্চজন্য করে তোলার জন্যে প্রকরণ কৌশল কত সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত, অভিজ্ঞান ও আবেগ কত সংশ্লেষিত ; বর্তমান কালের কবিতার মূল্যায়নে তা সর্বথা ও সর্বদা বিচার্য। এই মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলেই মাইকেলের মধ্যে এ সমস্ত গুণের সমাবেশ দেখে সুধীন্দ্রনাথ, অনুকম্পা সত্ত্বেও, তাঁকে প্রংশসা করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু মাইকেলের মামলা খারিজ করার রায় দিতে গিয়েও তাঁর সৃষ্টির পেছনে অনুপ্রেরণার পরিবর্তে অধ্যবসায় ও সীমাহীন প্রযত্ন দেখে প্রশংসা করেছেন। বিশেষত তাঁর ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাগ্রসরতায় মুগ্ধ হয়েছেন।[২১] অনুপ্রেরণারূপ অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে সান্দিহান হলেই যে লৌকিকক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়ই তা তাঁদের কথায় ও কার্যে প্রমাণ করেছেন।

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, মাইকেল যে একটা বিশেষ সময়ে একাধিক কাব্য ও নাটক যুগপৎ রচনা করেছিলেন — যেন সৃষ্টির বান ডেকেছিলো অথবা সুধীন্দ্রনাথের 'এই পাঁচ বছরের মধ্যে (১৯৩১-৩৬) এমন দিনও গেছে যখন তিনি একই দিনে

সাতটি শেক্সপীয়র-সনেট অনুবাদ করেছেন, একই দিনে রচনা করেছেন কবিতা ও গদ্য, কেনো লেখা শেষ করামাত্র আর একটিতে হাত দিয়েছেন। এক প্রবল আবেগ তাঁকে অধিকার করে রেখেছিলো, কোনো-এক অপূরণীয় ক্ষতির পরিপূরণস্বরূপ অনবরত ভাষাশিল্প রচনা ক'রে যাচ্ছিলেন ঃ[২২] — মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়ের এই যে এক আচ্ছন্ন সৃষ্টিশীল অবস্থা প্রত্যক্ষ করি এটার পেছনে অনুপ্রেরণা-নামক কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি কাজ করেছিলো কিনা। মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উভয়ের চারিত্র ও আমৃত্যু কার্যধারা বিশ্লেষণ করে এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা সম্ভব। 'কবিদের মধ্যে দুটো জাত আছে ঃ যাঁরা ঝোঁকের মাথায় লেখেন, আর যাঁরা ভেবে-চিন্তে; যাঁরা কবিতা লেখেন না-লিখে পারেন না বলে, আর যাঁরা লেখেন লিখতে হবে বলেই। কোনো-কোনো কবি আছেন স্বভাবতই মাতাল, কোনো-কোনো কবি নিতান্তই প্রকৃতিস্থ। প্রথম জাতের কবিদের আবেগই হলো উৎস, দ্বিতীয় জাতের কবিরা বুদ্ধিনির্ভর।...শেলি, ও অউস্বার্থ রবীন্দ্রনাথ প্রথম জাতের মিলটন, মধুসূদন মোহিতলাল দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত।'[২৩] এই শ্রেণীকরণ অনুসারে সুধীন্দ্রনাথ মাইকেলের অনুগামী মাত্র।

দেশবিদেশের সাহিত্যসমূদ্র থেকে আহরিত রত্নরাজির সমাবেশে, আবেগ ও উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে মনন ও জ্ঞানকে কাব্যের প্রাণরূপ প্রতিষ্ঠা করায়, নবছন্দ, আঙ্গিক ও প্রকরণের প্রবর্তনায়, প্রশস্ত বিশ্বের পটভূমিকায় বিষয়বস্তু উপস্থাপনায়, মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়ের কাব্য সমসাময়িক পাঠকগোষ্ঠীর কাছে দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। মধুসূদনের সমকালে 'সাহিত্য ব্যবসায়ীরা প্রধানত ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, মধুসূদনের ব্যঙ্গোক্তিতে 'barren rascals', যাঁহাদের ওরিজিনালিটি ছিল না এবং যাঁহারা সাহিত্যবিচার করিতেন সংস্কৃতসাহিত্যের সঙ্গে পাঠমিলাইয়া। অপর দল ইংরেজিনবীশ, যাঁহাদের সম্বন্ধে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন, 'the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read।'[২৪] এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো একান্ত উদার পণ্ডিত অমিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের কাব্যের রস সহজে গ্রহণ করেননি। সাক্ষ্য হিসেবে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মাইকেলের চিঠি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> You will be pleased to hear that pundits are coming round regarding Tilottoma. The renouned Vidyasagar has at last

> condescended to see "Great merit' in it, and the Someprokash has spoken out in a favarable manner."[২৫]

পুনরায়

> You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness and almost affection; He is not quite habituated to the new music yet—but of the genuine character of the poetry he does not appear to entertain any doubt.[২৬]

মাইকেলের কাব্যকলাকে এ যুগে কেউ দুর্বোধ্য বলে ভ্রম করেনা। আভিধানিক শব্দাক্রান্ত বক্তব্য প্রধান তাঁর কবিতা বড়োজোর অভিধানের সাহায্য নিয়ে স্থান-বিশেষে পড়তে হয়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দুর্বোধ্য বলে খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জন করেছেন কেবল অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারের জন্যে নয়। তাঁর মিতভাষণ এতদিনের বাংলা রোম্যান্টিক কবিতায় অভ্যস্ত পাঠকের জন্যে যথেষ্ট নয়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দে শব্দে যে মনন ও আবেগের সংশ্লেষ, তার বেড়াজাল অতিক্রম করে রসাস্বাদন অপটু পাঠকের পক্ষে অসম্ভব নাও-যদি হয়, সুকঠিন। মালার্মের আদর্শে বিশ্বাসী, সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন শব্দপ্রেমিক, শব্দের গূঢ়তম অর্থ—বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ—অন্বেষণ তিনি করেছেন। পল ভালেরি, প্রুস্ত প্রমুখ পাশ্চাত্য কবির সঙ্গে ভাবনায় যে ঐক্য সুধীন্দ্রনাথ অনুভব করেন, তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ এমন কতগুলো চিত্রকলা ও ব্যঞ্জনার তিনি সৃষ্টি করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে যা তখনো পর্যন্ত অনন্য ছিলো। তদুপরি মাইকেলের তেমন কিছু না-থাকলেও সুধীন্দ্রনাথের মনে-প্রাণে বিশ্বাস ছিলো একটি বিশিষ্ট দর্শনে। 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে' তিনি 'যে-দার্শনিক মতে উপনীত হন, তা যখন প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সংস্করণ' এবং তিনি 'বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক ব'লেই' অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র একটি সুচিন্তিত মতবাদ তাঁর রচনার সর্বত্র লক্ষ্য যোগ্য। যুগযন্ত্রণা ও জটিলতা এবং জ্ঞান ও সংশয়জাত তাঁর দর্শনের স্বরূপ উপলব্ধি ব্যতিরেকে, বলা বাহুল্য, নৈয়ায়িক সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য সুস্পষ্ট হতে পারেনা। এই জন্যে সমকালীন পাঠকসমাজ সুধীন্দ্রনাথকে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। কিন্তু রসতীর্থ পথের পথিক সমসাময়িক কবিগণ — রবীন্দ্রনাথ

সহ — সুধীন্দ্রনাথকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। এবং আপাতকাঠিন্য তাঁদের কাছে সুধীন্দ্রনাথকে আড়াল করে রাখতে পারেনি। তাঁর ভেতরের শিল্পীটি ধরা দিয়েছিলেন এঁদের অনুভূতির সমক্ষে। বুদ্ধদেব বসু এঁর কবিতায় নৈয়ায়িক যুক্তিনিষ্ঠা লক্ষ্য করে এ পর্যন্ত বলেছেন, 'অসংলগ্নতা সুধীন্দ্রনাথের বিভীষিকা। ... দর্শনের যুক্তির মতো, বা জ্যামিতির প্রস্তাবের মতো, তাঁর কবিতাকে ধাপে-ধাপে অনুসরণ করা যায়, প্রতিটি পংক্তির বা শব্দের 'অর্থ' সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত সেখানে।'[২৭] সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন এমন যুক্তিনিষ্ঠ, এমন সুমিত তাঁর বাক্যবিন্যাস, পংক্তি-সমূহের পারম্পর্য এমন নির্বিকার; এবং শব্দ-প্রয়োগ এমন যথার্থ, যে মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না করলে তিনি হয়তো প্রাঞ্জলতার উদাহরণ ব'লেই গণ্য হতেন।'[২৮]

সমকালীন পাঠকগোষ্ঠীর অনীহা আলোচ্য দুই কবি সম্বন্ধে, হতে পারে তা এঁদের কাব্যে সাময়িকতার অভাব হেতু। জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি যে সাময়িকতা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। অন্তত জনপ্রিয়তার একটি প্রধান শর্ত সকালের প্রতিফলন, নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা চলে। এ দেশে ইংরেজদের আগমন প্রাচীন জীবনধারার সঙ্গে যে অভিঘাতের সৃষ্টি করে একটি নব মূল্যবোধ তার ফলশ্রুতি। কম করে বলতে হয় এই নবচেতনা বাংলার জীবন তথা বাংলা সাহিত্যের যুগান্তর ঘটিয়েছিলো। কুপমণ্ডুক বাঙালি বহির্বিশ্বের জ্ঞান ও রসের আস্বাদন লাভ করার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলো এই নতুন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে। অপর পক্ষে, জীবনের বহিরঙ্গে যে পরিবর্তন সূচিত হলো, সেটা দেখালো বিদ্রোহের মতো, বিশৃংখলার মতো। ঋতুবদল চলছে, অথচ নতুন হাওয়া স্থির হতে পারেনি — সেই anomy — নবমূল্যবোধহীন নৈরাজ্যের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙালির জীবনে একটি মাত্রাহীনতা পরিলক্ষিত হয়। ভালোয়মন্দয় মেলানো এর সব লক্ষণই মাইকেলের চরিত্রে পরিস্ফুট। তবু তাঁর সাহিত্যে এ সবের প্রতিবিম্বন নেই বললেই চলে। সমুদ্রের উপরিভাগের চাঞ্চল্যের নীচেই যে-প্রশান্তি ও গভীরতা বিরাজমান, মাইকেলের সাহিত্য তা-ই স্বীকৃত। মাইকেলের জীবন অসংযমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর সাহিত্য ক্লাসিক সংযম ও সংহতির অতুলনীয় উদাহরণ। মনে হয় তাঁর আপন জীবনে যে অপূরণীয় অভাব বিদ্যমান ছিলো, তা-ই প্রাচীন কালের সরল জীবনযাত্রা এবং ঐশ্বর্যের মধ্য তৃপ্তিলাভ করার প্রয়াস পেয়েছে। তাঁর রচনায় স্বকাল এইটুকু পর্যন্ত যে কতিপয় সনেটে তিনি স্বীয় যুগের কয়েকজন মনীষীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করেছেন আর প্রহসনদ্বয়ে সমকালীন জীবনের অসঙ্গতি কদর্যতা ও কুটিলতাকে

রূপায়িত করেছেন। আপন কালের প্রতি কেমন নিস্পৃহা একটি মাইকেলি বৈশিষ্ট্য।

সুধীন্দ্রনাথ আপনাকে বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী বলে দাবি করেছেন। বৃদ্ধকালের অস্বাস্থ্য; যন্ত্রণা ও সংশয় তাঁর মধ্যে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করা যায়। এমনকি সংবর্তের কবিতায় যুদ্ধআবিল বিংশ শতকী চেহারা সুস্পষ্ট।

প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে তমিস্রার লজ্জাবস্ত্রে আজ
এসো নগ্ন মনুষ্যত্ব ঢাকি। (উপসংহার, সংবর্ত, কাব্য
সংগ্রহ, পৃ ১৭৮)

নিশ্চিহ্ন সে-নচিকেতা; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি
আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।
কাল পেঁচা, বাদুড়, শৃগাল
জাগে শুধু সে-তিমিরে; প্রাগ্রসর রক্তিম মশাল
অমাকে আবিল করে; এক চক্ষু ছায়া,
দীপ্ত-নখ, স্ফীত-নাসা, নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া
চতুর্দিকে চক্রব্যূহ বাঁধে।
অপমৃত বিধাতার লগ্নভ্রষ্ট প্রেত যেন কাঁদে
নিষেধের বহিঃপ্রান্তে কোথা। (উজ্জীবন, পৃ ১৮০-১)

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ
এ যুগের চাঁদ কাস্তে।

*

শুষ্ক ক্ষীরোদসাগরে মগ্ন বিষ্ণু
নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিষ্ণু, (কাস্তে, পৃ ১৮৭)

অপমৃত ভগবান; অস্তাচালে রক্তাক্ত অঙ্গার;
অরাজক চরাচরে প্রত্ন প্রতিহিংসায় প্রতুল:
আর্তদেব বিবর্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল,
তাই সে আজ, তার ধর্ম আত্মীয় সংহার
(জাতক ১, পৃ ১৮৭)

অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী ঃ
রুষের রহসে লুপ্ত লেলিনের মমি,
হাতুড়ি নিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন,
মৃত স্পেন, ম্রিয়মান চীন,
কবন্ধ ফরাসী দেশ। (সংবর্ত, পৃঃ ১৯৪)

তুমি বলেছিলে জয় হবে, জয় হবে ঃ
নাটসী পিশাচও অবিনশ্বর নয়।
জার্মানি আজ ম্রিয়মান পরাভবে ;
পশ্চিমে নাকি অপগত অরুণোদয় !
অন্তত রুষ বাহিনী বন্যাবেগে
কবলিত করে শোষিত দেশের মাটি ;
বিভীষণদের উচ্ছেদে ওঠে জেগে
স্বাধীন প্যারিস, যথারীতি পরিপাটী ;
এ-বারে সমরে শান্তিতে সহযোগী
মার্কিন চালে সমানে শোনিত, টাকা ;
ধনিক যুগের প্রধান ভুক্তভোগী
ইংলণ্ডেই সমাজতন্ত্র পাকা॥

*

স্থগিত ভারতে আপ্ত কালান্তর
জিন্না যেহেতু বিমুখ গান্ধীবাদে। (১৯৪৫, পৃ ১৯৭)

বিধ্বস্ত প্রতিবেশের ছাপ এ সব কবিতা এবং সংবর্তের অন্যান্য কবিতায় সুস্পষ্ট। এবং 'যুগের জীবনতত্ত্ব তাঁর চাইতে বেশি কেউ পরিবেষণ করেননি।'—সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এ মত সত্ত্বেও সাময়িকতা সুধীন্দ্রনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করলে কবির প্রতি অবিচার করা হবে। কেননা এ বারে তাঁর হৃদয়ের যে বিক্ষোভ, হতাশা ও আর্তি প্রকটিত, সেটা সদ্য ক্রূর আঘাতজনিত আর্তচৎকার। সুধীন্দ্রনাথ মূলত ও প্রধানত তাঁর কাব্যের অঙ্গীভূত করেছেন চিরন্তন প্রেম, কাল ও ভগবানকে। তিনি বলেছেন বটে, ক্ষণবাদী তিনি ; তৎসত্ত্বেও শাশ্বত কাব্য বস্তুতেই তাঁর স্ফূর্তি। অসীম জ্ঞানের অধিকারী এবং তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ বারবার আবেগের অলিঙ্গনে ফিরে এসেছেন। তাঁর তত্ত্বজ্ঞান তাঁকে সংযমী করেছে, মননশীল করেছে, যুক্তি-নিষ্ঠ করেছে ; তবু কেলাসিতরূপ ধরে যার প্রকাশ তাঁর রচনায়, যার তাপে সজীব তাঁর

কাব্য, তা সুপ্রাচীন এবং নিত্যনবীন মানবিক আবেগ। সুধীন্দ্রনাথকে, সুতরাং গুটি কতক কবিতার পটভূমিকায় একটি খণ্ডকালের মধ্যে চিহ্নিত করলে, তাঁকে যথার্থরূপে উপস্থিত করা হবে না। মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়ই বহির্জীবনে স্বকালের মানুষ—স্বকালের অত্যাধুনিক রুচিসম্মত মানুষ ; কিন্তু অন্তর্জীবনে তাঁরা যেন, একটি দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে যে হাওয়া বয় তা কালবৈশাখীর প্রলয়বাত্যা নয়, ফাল্গুনের আতপ্ত মৃধু সমীরণ। তাঁদের যে বাসনা চরিতার্থ হয়নি জীবনে এবং স্বসমাজে, স্ব স্ব মানসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে স্বপ্নে যেন সে-পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করেছেন। স্বপ্নভঙ্গে উভয়ই যে উলঙ্গ প্রতিবেশ দেখেছেন, তারই নগ্নচিত্র অঙ্কিত উভয়ের সাময়িক সাহিত্যে।

কেবল স্বকাল নয়, মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথে স্বসমাজ না-হোক, সমাজের সম-কালীন মানুষও অনুপস্থিত। অন্তত মানসিক জগতে উভয়ই যে 'মিনারবাসী' ছিলেন, এটা সুস্পষ্ট হয় এই থেকে যে উভয়ের রচনাতে 'জনতা'র কোনো অনধিকার প্রবেশ নেই ; নেই জনতার ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন, অথবা তাদের আশা নিরাশার প্রতিধ্বনি। মাইকেলে সেটার অনুপস্থিতি অস্বাভাবিক নয় কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ যে-কালে কবিতা রচনায় হাত দেন তার পূর্বেই সাহিত্য সুদূর সৌন্দর্যলোক হতে গণজীবনের সান্নিধ্যে এসেছে। সমকালীন সাহিত্যের একটি প্রধান ধারা তখন গণজীবনের দুঃখদৈন্যকে রীতিমতো অঙ্গীকার করেছে। রবীন্দ্রমুক্তির যে-আন্দোলন বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে দানা বাঁধে তার শ্রেয়তার একটি প্রধান ধুয়ো ছিলো দরিদ্রনারায়ণের সেবায় সাহিত্যকে নিয়োজিত করা। জীবনানন্দ এবং সুধীন্দ্রনাথ কী করে জন-প্রিয়তার প্রলোভন এড়িয়ে স্বগতসংলাপে মুখর হয়েছিলেন ভাবলে বিস্ময় লাগে। জনতাকে মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ এড়িয়ে গিয়েছিলেন না-বলে, বলা উচিৎ ওদের সঙ্গে তাঁরা একাত্মবোধ করেননি। মাইকেল আপনাকে নিশ্চয় স্বসমাজের মানুষদের চেয়ে অভিজাত মনে করতেন। জ্ঞানের সাধক, পণ্ডিত, পরিশীলিত রুচির অধিকারী সুধীন্দ্রনাথও সম্ভবত আপনার অবস্থান সাধারণ মানুষ থেকে বহু দূরে বলে প্রত্যক্ষ করেছেন, নিদেন পক্ষে ভিড়ের একজন বলে আপনাকে যে সনাক্ত করেননি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বরং বলেছেন,

ভিড়ের সংসর্গ মোরে করে সদা নৈঃসঙ্গ্যবিব্রত।

*

আমারে ডরায় লোকে, জনসংঘ বিভীষিকা মোর। (প্রতীক, ক্রন্দসী, পৃঃ ১০)

কখনো কখনো তিনি যে ইতরজনের ভিড় ছেড়ে আপন হৃদয়অরণ্যে পলায়ন করতে চাননি তা-ও নয়। তিনি নিজে যে স্বাতন্ত্র্যের পূজরী ছিলেন, গড্ডালিকার প্রবাহে তার নিদারুণ অভাব দৃষ্টেই হয়তো এই পলায়নী মনোবৃত্তি জেগেছে।

তোমার প্রমাদে
আবার ফিরায়ে লও মোরে।
হয়তো সেখানে আজও স্বতন্ত্রতা মিলে মাঝে মাঝেঃ
নগণ্যের অভীপ্সারে প্রতিহত ক'রে
এখনও দিগন্তে সেথা পরিচ্ছন্ন হিমাদ্রি বিরাজে ; (মৃত্যু, ক্রন্দসী, পৃ ১১৬)

জনতার স্থূলতাকে অসহ্য বিবেচনা, বর্তমান কবিদের হয়তো সহজাত। যে পরিবারে আলোচ্য কবিদ্বয়ের জন্ম, যে পরিবেশে তাঁরা লালিত ও শিক্ষিত, তা-ই কি দায়ী এই মেজাজের জন্যে? হতে পারে, হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মাইকেলের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত তৎকালীন স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত ও কলকাতার ধনিকদের অন্যতম ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্তও রাজনারায়ণের মতো প্রতিষ্ঠিত আইন-ব্যবসায়ী ও বিত্তবান ছিলেন। তদুপরি পণ্ডিত ছিলেন। মাইকেলের সময় হিন্দু কলেজ ও বিশপ্‌স্‌ কলেজ ছিলো অভিজাতদের জন্যে সীমাবদ্ধ। থিয়োজফিক্যাল হাই স্কুলও নির্বাচিত অভিজাতদের বিদ্যালয়। অসম্ভব নয় যে অভিজাত্য গর্বের জন্যেই, কেউ-ই, এমনকি, পাঠ সমাপ্ত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। লেখাপড়া সাঙ্গ করার আগেই মাইকেল বিশপ্‌স্‌ কলেজ ছেড়েছিলেন। পরে অবশ্য অর্থ ও খ্যাতির লোভে বিলেত গিয়েছিলেন এবং ব্যারিস্টার হয়েছিলে। আর সুধীন্দ্রনাথ স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি-এ-ই পাশ করেছিলেন। এম. এ. অথবা আইন অধ্যায়ন যদিও করেছিলেন, পরীক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করলেন না। সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন আইন অধ্যয়নের পরে, মাইকেল আগে। নয়তো নৈয়ায়িক কোনো সাদৃশ্য উভয়ের রচনায় গবেষক হয়তো খুঁজে পেতেন। মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়ই সমাজের উপর তলার মানুষ, তদুপরি তাঁদের দৃষ্টি ঊর্ধমুখী ; জনকোলাহল এই কারণেই তাঁদের সঙ্গীতে অনুপস্থিত।

জনতার মতো মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথে আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত নিসর্গও। বাংলা দেশে প্রকৃতি প্রেমিক কবিদের প্রাদুর্ভাব প্রাচীন কাল থেকে। মধ্যযুগে প্রকৃতি

অনুষঙ্গ বা উপলক্ষ হলেও, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদের বেলায় বহু স্থানে প্রকৃতিই লক্ষ্য। এঁদের রচনাতে বিশুদ্ধ নিসর্গপ্রীতি রূপায়িত। মাইকেল মহাকাব্যের প্রতি যেরূপ নেশাগ্রস্ত ছিলেন, সম্ভবত তার ফলে চতুর্দিকের পৃথিবীকে—যে নিত্য নানা রঙে রসে আমাদের অস্তিকে ভরে তুলে আমাদের উজ্জীবিত করে রাখে — চোখে পড়েনি। সুধীন্দ্রনাথের মানসিকতা যে যুগের কাব্যে লালিত, তার অনেকটাই নিসর্গ-প্রেম-পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ — জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক সকল বিখ্যাত কবি তাঁদের সাহিত্যে প্রভূত প্রযত্নের সঙ্গে প্রকৃতিকে অঙ্কিত করেছেন। প্রেম ও সৌন্দর্যের সাথে প্রকৃতিকে একাত্ম করে অনেক ক্ষেত্রেই চিত্রিত করা হয়েছে। এই প্রবল প্রভাব মুক্ত হয়ে সুধীন্দ্রনাথ কেমন করে নিসর্গ সম্ভোগ থেকে বিরত থাকলেন, সেটা ভাববার বিষয়। হয়তো যুগজটিলতালাঞ্ছিত, জ্ঞানসংশয় জর্জরিত অন্তরে একান্ত নির্বাক ও প্রায় জড় প্রকৃতি কোনোরূপ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি। সুধীন্দ্রনাথের আপাত সুবিন্যস্ত ও অতিসংযত হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে অত্যন্ত দোদুল্যমান সংশয় ও উন্মুখর অতৃপ্তি ছিলো, এটা সুস্পষ্ট। মানুষী ভালোবাসা ও অস্থির আস্তিক্য-বোধ তাঁকে প্রতিমুহূর্তে এত বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করেছে যে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যে ক্বচিৎ ধ্যানস্থ হতে পেরেছেন। তাছাড়া মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথে নিসর্গপ্রীতির যে অভাব হতে পারে তা উভয়ই নাগরিক কবি ছিলেন বলে। রুচির পরিমার্জনায়, আচার আচরণ ও রচনার বৈদগ্ধ্যে দত্ত কবিদ্বয় আকস্মিক ও আশ্চর্যজনক ভাবে নাগরিক। আভিজাত্য, অধ্যয়ন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ওঁদেব যে সাদৃশ্য সেটা প্রধনত এই শাহরিক মনোভাবের জন্যে। মাইকেল যেমন কখনো কখনো নিশাকালে নদীতীরের বটগাছ দেখে অথবা সায়ংকালের একেশ্বরী তারকা দেখে বিমুগ্ধ হয়েছেন, অথবা নদীগিরিবনরাজির শোভা সোৎসাহে বর্ণনা করেছেন ; সুধীন্দ্রনাথেও তেমনি প্রকৃতির চকিত প্রকাশ লক্ষণীয়। কিন্তু কেউ-ই প্রধানত নিসর্গবিলাসী নন, যেমন সমকালীন কবিদের অনেকেই ছিলেন।

প্রকৃতিতে যে অনাবিল প্রশান্তি আছে, নিসর্গ প্রেমিক কবিদের চরিত্রে সেই সমাহিত-চিত্ততা ও অতল স্থৈর্যের ছাপ সম্ভবত অনুভব করা যায়। ওঅউস্বার্থ, রবীন্দ্রনাথে অথবা জীবনানন্দের মধ্যে যে প্রশান্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথে সেই পরিমাণ বিক্ষুব্ধতা।

> আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী-একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি! কী শান্তি, কী স্নেহ, মহত্ত্ব, কী

> অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্র-লোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একেলা বসে থাকি।[২৯]

— এই ধ্যানগম্ভীর প্রকৃতির সীমাহীন শান্তি মাইকেল অথবা সুধীন্দ্রনাথের চরিত্রে ছিলোনা, তাই ওঁরা তার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে সক্ষম হননি। কিংবা হয়তো প্রকৃতির সঙ্গে যোগশূন্য হয়ে মানসিক স্থৈর্য তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। মাইকেল বহির্জীবনে চরম উচ্ছৃংখলা ছিলেন, অন্তর্লোকে সৃজনের মুহূর্তে সংযমী হলেও, অত্যন্ত চঞ্চল ও বিকারপূর্ণ ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের বহির্জীবনে প্রশংসনীয় শৃংখলা সত্ত্বেও[৩০] হিসেবিবুদ্ধিতে তাঁর বহু বেহিসাব লক্ষ্যযোগ্য। আর অন্তর্জীবনে আশ্চর্য ধ্রুপদী সংযম ও কাঠিন্য সত্ত্বেও কেবলি বহুক্ষত বিদীর্ণ হৃদয়ের আর্তনাদ ও বিলাপ, এবং দ্বিধা প্রশান্তিকে বিঘ্নিত করেছে।

এই অশান্তিজনিত হতাশা ও হতাশ্বাস বারবার মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথে উচ্চারিত হয়েছে। তাই জীবনের আপাত পরিপূর্ণতার মধ্যেও উভয়ে বিলাপে মুখর হয়েছেন। আবাল্য কাঙ্খিত কবি-খ্যাতি লাভ হয়েছে, অনিকেত দশা ঘুচেছে, দীর্ঘদিনের অর্থ-কৃচ্ছ্রতা শমিত হয়েছে, দৃশ্যত সেই সুখের সময়ে (১৮৬১) মাইকেল রচনা করে-ছিলেন 'আত্ম-বিলাপ'।

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে?

তৎকালীন বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে মাইকেল নিঃসন্দেহে কবি হিসাবে অনন্য ও বিশিষ্টতম আসন পেয়েছিলেন। ১৮৬২ সাল পর্যন্ত মাইকেল পরবর্তী জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতাও লাভ করেননি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি প্রায় সর্বত্র বিষাদাক্রান্ত। অন্যরূপ আয়োজন সত্ত্বেও, তাঁর সকল নাটক ও কাব্যের প্রধান উপজীব্য করুণ রস। 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'—এ প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারেননি। স্বীয় জীবনের কাতর ব্যর্থতাকে তিনি তাঁর নায়কনায়িকাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি নিজেকে মনে করেছিলেন অদৃশ্য কোনো শক্তির ক্রীড়নকরূপে। তিনি প্রাণ-

পণ প্রযত্ন করতে পারেন, কিন্তু তবু সে অন্ধ শক্তির হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন না। তাঁর এই কল্পিত অমোঘ নিয়তিকে তিনি বিবেচনা করেছেন কর্মনিরপেক্ষ বলে। কৃষ্ণকুমারী এই নিয়তির শিকার, ইন্দ্র ও ইন্দ্রজিৎ এবং রাবণের ভাগ্যও নিয়তির হাতে পুতুল খেলা মাত্র।

'প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?'

অথবা কি পাপে লিখিলা, বিধি, এ দারুণ জ্বালা
রাবণের ভালে?

হায়, দেবি,
দেব কি মানব, কার হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?

অথবা
বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?

এ সমস্ত পংক্তিতে নিয়তির হাতে মানুষের একান্ত অসহায়তা প্রতিপন্ন হয়েছে। মানুষের এই পরাজয় আপন জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, 'আত্মবিলাপে'র হাহাকার এবং রাবণের আর্তনাদ ঐকতান সৃষ্টি করেছে।

সফলতার সকল সম্ভাবনা সত্ত্বেও মাইকেলের জীবনে যে ব্যর্থতা ও ট্র্যাজেডি, তা যেমন জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে প্রকটিত তাঁর কবিকর্মে, সুধীন্দ্রনাথের আপাত ঐশ্বর্যের আড়ালে যে সুতীব্র হতাশা তা-ও তেমনি তাঁর রচনায় প্রকাশিত। মাইকেলের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের লক্ষণীয় পার্থক্য এই যে সুধীন্দ্রনাথের জীবনে দৃশ্যত কোনো অভাব কোনো ক্ষোভ ছিলো না। অর্থসচ্ছলতায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে, রূপে-গুণে সুধীন্দ্রনাথের কোথাও কোনো ফাঁক ছিলো না। এমন কি, মহাকবি হবার ও বিলেত যাবার লোভে তাঁকে স্বধর্ম অথবা স্বজন ত্যাগ করে পরিশেষে বিফল মনোরথও হতে হয়নি। তবু তাঁর রচনার আগাগোড়া যে সামান্য লক্ষণটি দ্রষ্টব্য তা বিষণ্ণতা ও হতাশার। কাংক্ষেয় সকল সম্পদের অধিকারী হয়েও সুধীন্দ্রনাথ কেন অচরিতার্থতার মনোবেদনায় জর্জারিত হয়েছেন? কেন বলেছেন? — 'আমি অন্ধকাকে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি; সদ্‌গতির আগেই হয়তো আবার তমসায় তলাবো।'[৩১] কারণ যা-ই হোক সুধীন্দ্রনাথের বিলাপ ও বিক্ষোভ অত্যন্ত স্পষ্ট, অস্বীকৃতির বাইরে। সাধারণত আত্মবিলাপের কাল বার্ধক্য। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য-

গ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা'তেই এই হাহাকারের শুরু, এবং এর শেষ হয়নি কোথাও। অজ্ঞাতকে জানার প্রয়াস মানুষকে স্বর্গচ্যুত, নিশ্চিত আয়েস থেকে বঞ্চিত করেছিলো। কিন্তু জগৎ ও জীবনের অর্থ অন্বেষণের ফলশ্রুতিস্বরূপ মানুষ প্রশান্তি লাভ করেনি; উপরন্তু মূর্খতার আরামকে হারিয়েছে। স্বর্গের বাস্তবিকতা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়, কিন্তু বোকার স্বর্গ প্রশ্নাতীত। জ্ঞান ও দর্শন সুধীন্দ্রনাথ এতটা আত্মসাৎ করেছিলেন যে সহস্র সংশয় ও অতৃপ্তি তাঁর অন্তরকে শধাবিদীর্ণ করেছিলো। শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে যে অন্ধতার আবশ্যক কবির তা আদৌ ছিলো না। ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধা, ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাস, শাশ্বত প্রেমে আস্থা, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধতা—মানসিক প্রশান্তির এই সকল পথই সুধীন্দ্রনাথের কাছে ছিলো রুদ্ধ। অগ্রজের স্থূলতায় তিনি একান্ত উন্নাসিক। অনুকম্পা ও কৃপার চোখে গণ্য করেছেন আত্মমুগ্ধ এই পূর্বগামীদের। যে-ঈশ্বরবিশ্বাস সকল বিফলতা ও হতাশ্বাসে সান্ত্বনার সুস্পষ্ট প্রলেপ দেয়, তিনি তা থেকেও বঞ্চিত।

আরও কিছু চাও?
ক্লান্ত আমি অব্যাহতি দাও।
আলেয়ার ডাকে
দুর্লভ যৌবন মোর রুদ্ধ আজ পঙ্কের বিপাকে;
মুছেছে আমার ভবিষ্যৎ;
অতীতের পথ
অবলুপ্ত বিনষ্ট স্বর্গের ধ্বংসস্তূপে;
চুপে চুপে
ছেড়ে গেছে অন্তর্যামী আরাজক অন্তর আমার;
আশা নাই, ভাষা নাই, কেবল ধিক্কার
রিক্ত মর্মে মাথা কুটে মরে;
মৃত্যুর পাথেয়-মাত্র রাখি নাই সঞ্চয়ন করে॥

(বিস্মরণী, অর্কেস্ট্রা, পৃ ৫৪)

এই নৈরাশ্য ও অবলম্বনহীনতা দূরীভূত হতে পারত, ঈশ্বরবিশ্বাসের দুর্গ নির্মাণ করতে পারলে। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছেন বিধাতা মৃত।

'পিশাচহস্তে নিহত বিধাতা।' (বিস্মরণী, ঐ, পৃ ৫২)

কিন্তু এই অপমৃত বিধাতাকে আকড়ে ধরার জন্যে তাঁর অন্তরের গভীরে ঐকান্তিক আকুলতা ছিলো বলে সন্দেহ হয়।

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস
*
রৌদ্র জ্যোতি হতে
আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায় ভাগে।
ঘুণ-ধরা হাড়ে যেন লাগে
উষ্ণপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ ;
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ॥

(প্রার্থনা, ক্রন্দসী পৃ ১২৫)

বর্তমান কবিতায় কেবলি যে পূর্বপুরুষের অন্ধত্বকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করা হয়েছে, সংশয়ে দোদুল্যমান বিক্ষত হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা যে উচ্চারিত হয়নি, নিশ্চয় করে বলা যায় না। জ্ঞানরূপ রৌদ্রজ্যোতি এবং অপজাত হৃদয়ের খেদ থেকে আত্মরক্ষা করার কামনা তাই তাঁর অত আত্যন্তিক।

ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই ?
নেই তুমি যথার্থ কি নেই ?
তুমি কি সত্যই
আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন ?
তপন্ত তপন
সাহারা-গোবির বুকে জ্বলে নাকি তোমার আজ্ঞায়
চোখের ইঙ্গিতে তব তমিস্রা করাল
ভারাক্রান্ত গগনেরে করে নাকি স্বচ্ছন্দে নিক্ষেপ
উন্মত্ত, উদ্বেল আৎলান্তিকে ?
স্তব্ধ গৌরীশঙ্করের বুকে
দিগম্বরী ঝঞ্ঝা সে কি বাজায় না তোমার বিষাণ
তাণ্ডবের উন্মত্ত হিন্দোলে ?
*
আজিকে আর্তের কাছে পারিবে কি করিতে প্রমাণ

নও তুমি নামমাত্র ;
তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব, ন্যায়নিষ্ঠ তুমি ভগবান ?
(প্রশ্ন, ক্রন্দসী, পৃ ৯৮,১০০)

পীড়িত অন্তর নিয়ে তিনি প্রার্থনায় মুখর, তাঁর মহিমায় বিশ্বাস স্থাপনের নিমিত্ত ব্যাকুল, তাঁকে প্রত্যক্ষ করার জন্যে উৎকণ্ঠিত—কেবল একবার যদি নিশ্চিত প্রমাণ পান। কিন্তু জড়বিধাতা কবির নিখিল-নাস্তি-আক্রান্ত হৃদয়ে কোন ধ্রুবজ্ঞান দান করেননি। ফলে তাঁর বিরামহীন জিজ্ঞাসা দিক হতে দিগন্তরে পুনশ্চ শান্তিহীন যাত্রায় বহির্গত হয়েছে।

আপনারে অহরহ খুঁজি
কিন্তু যার স্পর্শ পাই, নিগূঢ় বিশ্রম্ভালাপ বুঝি,
অন্বিষ্ট সে নয়।

*

ক্রূর ভগবান,
পাসরি সম্রাট-নিষ্ঠা অগোচর সামন্ত-সমান,
অনাদি নীরবে ব'সে মনের গোপনে
চক্রান্তের ঊর্ণজাল বোনে।

আমি যারে চাই
তার মাঝে ভেদ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, দেশ-কাল নাই।
(সন্ধান, ক্রন্দসী, পৃ ৭৪—৫)

কিন্তু অনুসন্ধানের শেষে তিনি সংশয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ভগবানে স্থায়ী বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। অথচ সুখী, নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার জন্যে তাঁর উদ্বেলতা প্রচণ্ড। তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের জয়সিংহের মতো চিরকালীন বিশ্বাসের ভিত্তি হারিয়ে বিচলিত, বিপর্যস্ত। তাই বারংবার জয়সিংহের মতো বলতে চেয়েছেন,

দূর হোক চিন্তাজাল! দ্বিধা দূর হোক!
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য ভালো, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক। কার্যের তো

শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা—
ধরে সে সহস্র মূর্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন ; চারিদিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। রবীন্দ্র রচনাবলী ২, পৃ ৩২৩-৪)

অথবা বিশ্বাস স্থাপন করতে চেয়েছেন ঃ

দেবী, আছ, আছ তুমি। দেবী, থাকো, তুমি।
এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে
যদি থাক কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে
'বসে, আছি'—নাই, নাই, নাই, দেবী নাই !
নাই ? দয়া করে থাকো ! আমি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর, জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ। (ঐ, পৃ ৩৪৬-৭)

শাশ্বত ভালোবাসার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হবেন, সেটাও সম্ভব হয়নি।

অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ ;
অসঙ্গত চিরপ্রেম ; (মহাসত্য, অর্কেস্ট্রা, পৃ ২১)

প্রেমের রহস্য কবির কাছে উদ্‌ঘাটিত। দুদণ্ডের মায়া প্রকৃতপক্ষে অলীক এবং মূল্যহীন ; এই যুক্তিহীন বিলাসের পরিণামে অমৃতের পরিবর্তে গরলই লাভ হয়, কবি তা জানেন বলেই প্রেমের স্থায়িত্বে তাঁর আস্থা নেই ; কাম্যও নয়। তাই প্রেমে মুহ্যমান হয়ে তিনি প্রেমিকের উপাসনায় ঔচিত্য ও যুক্তিবোধ ত্যাগ করতে অক্ষম। তাঁর স্বীকৃতি সুস্পষ্ট ঃ

বলিব না, "তুচ্ছ মানি ইন্দ্রের বৈভবও,
অন্তরের অন্তঃপুরে তব
পরিত্যক্ত স্থানটুকু দাও যদি মোরে।"
(মূর্তিপূজা, অর্কেস্ট্রা, পৃ ৯১)

অবশ্য শাশ্বত প্রেমই কামনার বস্তু, কেননা ক্ষণভঙ্গুর প্রেম ক্ষণিক বিদ্যুদ্‌দীপ্তিতে চোখ ধাঁধিয়ে পরমুহূর্তে দ্বিগুণ অন্ধকারে নিক্ষেপ করে।

তোমারে ভুলিব আমি, তুমি মোরে ভুলিবে নিশ্চয়;
মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব;
হরিবে অসংখ্য অলি যৌবনের অমৃত সঞ্চয়;
সর্বস্বান্ত মর্মে শুধু প'ড়ে রবে অবেদ্য অভাব।

(ভবিতব্য, অর্কেস্ট্রা, পৃ ২৬)

এই নিদারুণ অভাববোধ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সুধীন্দ্রনাথ তাৎকালিন নাস্তিক্যালোপ (temparary suspension of disbelief) করে বিশ্বাস করতে চেয়েছেন চিরন্তনতায়।

যেন না ভরাই বারংবার
বিরহসন্তপ্ত এই শূন্যতা আমার
নবনব ঝঞ্ঝারে আহ্বানি;
নাস্তিক বুদ্ধির বশে কোনও দিন যেন নাহি মানি,
হে অন্তরতমা
তুমি ভ্রান্তি যৌবনের, নও নিত্য সৃষ্টির সুষমা॥

(প্রলাপ, অর্কেস্ট্রা, পৃ ৩৫)

মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে চেয়েছেন—

আমার জাগর সপ্নলোকে
একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারই স্মরণ।

(নাম, অর্কেস্ট্রা, পৃ ৩৮)

ঘুরে ঘুরে উচ্চারণ করেছেন—

আজও বলি,
জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, আজও বলি—
অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
কাম্য শুধু স্থবির মরণ।

(ঐ, পৃ ৩৮)

কিন্তু তবু প্রেমের অমোঘ অনিত্যতার চিন্তা কবিকে চিরস্থায়ী নীড় রচনা করতে দেয়নি—মিলনের মধ্যাহ্নেও কালরাত্রিকে আহ্বান করেছে।

আমিতো করিনি কভু মনে,
কখনও করিনি মনে প্রভুত্বের উন্মাদ প্রমাদে,
রাগরিক্ত চিত্তপটে তব
অক্ষয় রেখায় আমি দীপ্র হয়ে রব ;
মিলনের তন্ময় প্রসাদে
ভুলি নাই দুর্নিবার বিকারের কথা ;
মানিনি ভঙ্গুর ভবে নিতান্ত সুলভ অমরতা।
(দৈন্য, অর্কেস্ট্রা, পৃ ৪৩)

অথবা

আমিতো তোমার 'পরে করিনি নির্মাণ
অভ্রভেদী স্বর্গের সোপান ;
স্থাপিনি অটল আস্থা বিদায়ের দিব্য অঙ্গীকারে ;
ভাবিনি তোমারে
নিষ্ঠার প্রস্তরমূর্তি, অমানুষ, স্থবির, নিষ্প্রাণ ;
ভুলিনি তো তুমি মুগ্ধ নিমেষের দান ॥
(মার্জনা, অর্কেস্ট্রা, পৃ ৪৮-৯)

তাই স্থায়িত্বে নয়, প্রেমের তাৎক্ষণিকতায়, দেহের দেউলে বিশ্বাস স্থাপন করে বিশ্বের গরলসাগর হতে সামান্যতম অমৃত সংগ্রহ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু

মিলনে ক্ষুধা মেটেনি কোনও কালে ;
কামনা শেষে মিশেছে এসে কামে।

তাই

হৃদয় তবু বিষাদে ভ'রে
নিরুদ্দেশ শূন্যে যবে চাই ;
পাইনা ভেবে শান্তিতে কী হবে,

সাধনাতে যে সিদ্ধি হেথা নাই ॥

(নিরুক্তি, উত্তর ফাল্গুনী, পৃ ১৪৪)

বলা বাহুল্য, দেহের সামর্থ্যর একটা গণ্ডি আছে। বিশেষত, জ্ঞান ও দর্শনের পথে যাঁর নিত্য আনাগোনা, মন যাঁর ঊর্ধ্বচারী, দেহের সীমানায় তাঁকে বাঁধা অসম্ভব। তাই না দেহে, না ক্ষণবাদে সুধীন্দ্রনাথ শান্তি ও সান্ত্বনার আশ্রয় পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথের ধর্ম ও প্রেমানুভূতির একটা বিরাট ব্যবধান লক্ষণীয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় উভয়ই স্বধর্মচ্যুত। মাইকেল আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে বিসর্জন দিয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁর চিরদিন ছিলো। সুধীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠান করে স্বধর্ম ত্যাগ করেননি বটে, কিন্তু নাস্তিক্যে পরিপূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করেছিলেন। ঘনিষ্ঠতর বিশ্লেষণ প্রমাণ করে মাইকেলের ধর্মচিন্তা সুধীন্দ্রনাথের মতো গভীর নয়। খ্রীস্টান হয়ে তিনি না খ্রীস্টানের বিধাতাকে সর্বন্তঃকরণে ভালোবাসতে পেরেছিলেন, না আপন পূর্বপুরুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে পেরেছিলেন। ধর্মের সঙ্গে, এই কারণে, তাঁর হৃদয়ের যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ ছিলো। এবং সেহেতু কোনো বড়ো ক্ষোভও তাঁর ছিলো না। অপর পক্ষে, সুধীন্দ্রনাথ নাস্তিক হয়েও ভগবানকে প্রবলভাবে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন। কেবল ভালোবাসার পাত্রকে জড় ও অকর্মন্য দেখতে পেয়ে, প্রভূত আন্দোলন কয়েছিলেন। তবে ধর্মের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মিল এই যে ধর্ম কাউকে শান্তি দিতে পারেনি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথের কৌতুহল ও উপলব্ধি মাইকেলের ছিলো না। যেমন ছিলো না সুধীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ও জটিল প্রেমানুভূতি। সুধীন্দ্রনাথ যা অনুভব করেছেন মর্মে মর্মে, মাইকেল যেন তা কেবল সহজাত ক্ষমতা বলে ক্ষীণতমভাবে উপলব্ধি করেছেন। ঈশ্বর-বিশ্বাসের মতো প্রেমও অতি বিশ্লেষণের ফলে ইন্দ্রজালহীন, মধুমায়াহীন, আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে। ভালো-বাসার জন্যে, ভালোবাসার চিরন্তনতায় বিশ্বাস করার জন্যে, ভালোবাসার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে কী সীমাহীন উৎকণ্ঠা সুধীন্দ্রনাথের। অথচ তাঁর পিপাসা নিবৃত্ত করার পক্ষে কত সামান্য তাঁর প্রাপ্তি। এই জন্যেই সুধীন্দ্রনাথে উপবাসীর হাহাকার, বিক্ষোভ। মাইকেলের জীবনে প্রেম কি এসেছিলো? বলা যায় না। অন্তত তার কোনো ঘনিষ্ঠ প্রমাণ তাঁর রচনাতে অনুপস্থিত। প্রেমের যে সামান্য প্রকাশ মাইকেলের রচনাতে, তা-ও স্বরূপগত ভাবে ভিন্ন সুধীন্দ্রনাথ থেকে। মাইকেলে দেহগন্ধী প্রেম

— পত্রকাব্যের স্থানবিশেষ ছাড়া — অকল্পনীয়, অপর পক্ষে সুধীন্দ্রনাথের নায়িকা মর্ত্যের, দেহের মধ্যেই পরম প্রাপ্তি তিনি অন্বেষণ করেছেন। মাইকেলে প্রেমের চেতনা এতই অস্ফুট যে সন্দেহ হয়, হয়তো গার্হস্থ প্রেমে তৃপ্ত হয়ে তাঁর প্রেমিক সত্তা চিরনির্বাণ লাভ করেছিলো। অতিসংবেদনশীল সুধীন্দ্রনাথের অন্তরে প্রেম সর্বব্যাপী, সেহেতু তাঁর কাব্যের প্রধান অংশের উপজীব্য প্রেম, প্রেমজাত নৈরাশ্য ও ক্ষণিক আনন্দ।

ঈশ্বর ও শাশ্বত প্রেমে অবিশ্বাসী সুধীন্দ্রনাথের বহু-বিক্ষত নাস্তিক আত্মা অনুভব করেছে সর্বান্তক বিনাশের পথে তাঁর নিত্য যাত্রা। নিয়তির মতো অনিবার্য সে বিনাশ। মধুসূদনে যেমন নিয়তি অন্ধ; অহৈতুক যুক্তিহীন ধ্বংসের পথে সে দ্রুত ধাবমান; সুধীন্দ্রনাথে তেমনি মহাকাল চরম সংহার ও নাশের মূর্তিতে প্রকাশিত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি সহজাত ধ্বংসের বীজ উপ্ত থাকে; সুধীন্দ্রনাথে সে হচ্ছে জ্ঞানের সাধনা। সে জ্ঞান সিদ্ধিতে, শান্তিতে পৌঁছে দেয় না; সে জ্ঞান আত্মাহা। সংশয়ের নরককুণ্ড প্রজ্বলিত করে সে সর্বনাশকে ডেকে আনে। এই অগ্নিতে জ্বলে জ্বলে তিনি অবশ্যম্ভাবী পরাভব ও বিনাশকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও বিপুল সে শক্তির কাছে — তাঁর ভাষায় 'ভবিতব্যে'র কাছে তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন, আত্মসমর্পন করেছিলেন। তাই পরাভবের বিষদাক্রান্ত তাঁর সকল রচনা। মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়ই পরাজিত সৈনিক, উভয়ের সুর এই জন্যে বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যপূর্ণ।

নৈরাশ্যবাদী বলেই সুধীন্দ্রনাথ পৌণঃপৌনিকভাবে ভরাডুবির দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। তিনি যে তরীতে যাত্রা করেছিলেন তা কখনো 'মগ্ন', কখনো 'ভগ্ন', কখনো 'ভ্রষ্ট'। যে সময়ে তাঁর যাত্রা তা হেমন্ত সন্ধ্যার 'ভ্রষ্টলগ্ন'। তাঁর কাছে অতীত অস্তিত্বহীন, বর্তমান ব্যর্থ ও ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। নিরঙ্কুশ শূন্যতাই তাঁর প্রাপ্তি।

মনে হয় ফাঁকি, সবই ফাঁকি,—
মায়ার মুকুরপটে রিক্তগত প্রতিবিম্ব আঁকি,
যত সত্তা চলে গেছে অন্য কোনও খানে
নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের সন্ধানে।
মনে হয় অতল শূন্যের শেষে পড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়,

দেখিতেছি ভ্রমিভ্রান্ত চোখে
গতাসু আলোর প্রেত বিচরিছে স্তবকে স্তবকে
নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিরসঙ্গ আঁধারে।
(অর্কেস্ট্রা, পৃ ৪৮)

জীবনানন্দ নয়, মৃত্যুর দুঃস্বপ্নই সুধীন্দ্রনাথে বারবার প্রতিফলিত।

মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা,
যাতনা, শুধুই যাতনা সুচির সাথী।
(সর্বনাশ, অর্কেস্ট্রা, পৃ ৫৬)

অথবা

কাল রাতে
এ-সংকীর্ণ সংসারের নির্বোধ সংঘাতে
চীর্ণ, দীর্ণ হৃদয় আমার
মৃত্যুর ঘণান্ধকারে খুঁজেছিলো নির্বাণ উদার
কণ্ঠকিত শয়ণীয়ে শুয়ে। (মৃত্যু, ক্রন্দসী, পৃ ১১৩)

অথবা

আজ যদি তুমি এসে থাকো ঠিক
তুলে দেব সবই তোমারে, বণিক ;
প্রাণের পসরা ফেরি ক'রে আর
ফিরিব না ভাঙা হাটে।
মরণ, সোনার তরণী তোমার
ঠেকেছে কি মোর ঘাটে ? (মরণ তরণী, উত্তর ফাল্গুণী, পৃ ১৪৫-৬)

অথবা

মরণ, তুমি তো আসিবেই এক দিন,
এসো তবে আজ বেগে।

*

এসো, হে মরণ এসো আজ দ্রুত বেগে।

আজি প্রেয়সীর সুরভিনিবিড় কেশে
দেখেছি তোমার ছায়া ; (মহানিশা, উত্তর ফাল্গুনী,
পৃ ১৫৭-৮)

অথবা

মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যু মাত্র নিশ্চিত ভুবনে ;
গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে ;
বস্তুর দুর্দান্ত চিতা অনির্বাণ শূন্যের সৈকতে

*

সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ সে কেবল সম্ভব স্বপনে ;
বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্যসত্য জাগ্রত জগতে ;
(দ্বন্দ্ব, উত্তর ফাল্গুণী, পৃ১৬৩)

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই নিরবলম্ব অসহায়তার জন্যে অনেকাংশে দায়ী শাশ্বতে অবিশ্বাস। ধর্ম ও প্রেম মাইকেল অথবা সুধীন্দ্রনাথ কেউ-ই আত্মিক সম্পদে পরিণত করতে পারেন নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই নিরবলম্ব অসহায়তার জন্যে অনেকাংশে দায়ী শাশ্বতে অবিশ্বাস। ধর্ম ও প্রেম মাইকেল অথবা সুধীন্দ্রনাথ কেউই আত্মিক সম্পদে পরিণত করতে পারেননি।

উপসংহারে মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথের আর একটি সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করা যাক। মাইকেলের কবিকর্মের এই এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য যে তাতে বহির্জগতের চিত্র ও ধ্বনি যতটা আছে, অন্তরঙ্গ উপলব্ধি ততটা নেই। অন্য দিকে, সুধীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয় সমূহ অত্যন্ত সচেতন ও স্পর্শকাতর। উপলব্ধির প্রগাঢ়তার জন্যেই হয়তো তাঁর অতুলনীয় ধ্রুপদী নিষ্ঠা সত্ত্বেও তিনি একান্তভাবে রোমানটিক কবি। বহিরঙ্গে তাঁর ক্লাসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এত প্রকট যে কোন কোন সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথ প্রকৃত অর্থে ক্লাসিসিষ্ট।'[৩২] তবু সন্দেহাতীতভাবেই সুধীন্দ্রনাথ রোমানটিক কবি। কেবল আত্যন্তিক নিষ্ঠা ও প্রকরণের একটা শক্ত মুখোশ তাঁর কবিতাকে ক্লাসিক আভিজাত্য দান করেছে। অন্যদিকে মাইকেল প্রধানত ধ্রুপদী কবি। কিন্তু তাঁর এপিক কাব্যের তলে তলে লিরিসিজমের একটি ফল্গুধারা বয়ে চলেছে।

তা ছাড়া শুদ্ধ লিরিক কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। মধুসূদনের রোমানটিক মনের পরিচয় বিধৃত তাঁর চিঠিপত্রেও। মনে হয় লিরিক কবিতাই ছিলো তাঁর যথার্থ ক্ষেত্র। সেই কারণেই ধ্রুপদী কবি নানা স্থানে স্বাক্ষর রেখেছেন গীতলতার। সুধীন্দ্রনাথ রিলিক কাব্য বৃত্তেই সঞ্চরণ করেছেন। কিন্তু তবু যে ধ্রুপদী নিষ্ঠার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন, তা থেকে মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, যুগের ধর্ম নিতান্তই প্রতিকূল না-হলে তিনি হয়তো ক্লাসিসিস্ট বলেই পরিচিত হতেন।

পাদটীকা

১. জীবনানন্দ দাশ ; কবিতার কথা ; দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৯।

২. যোগীন্দ্রনাথ বসু ; মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ১০০—১।

৩. K. L. Haldar ; Michael Madhusudan Dutt ; National Magazine ; January, 1892 ; p 35.

৪. ১৮ আগস্ট ১৮৪৯ তারিখের পত্র। মধুস্মৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৫৯২।

৫. বুদ্ধদেব বসু ; 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' ঃ কবি ; সঙ্গ ঃ নিসঙ্গতা ঃ রবীন্দ্রনাথ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৮১—২।

৬. ঐ ; পৃ ৮৬—৭।

৭. ঐ ; পৃ ৮৪।

৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ; শর্মিষ্ঠা ; প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনা। পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত।

৯. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ; 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' ; চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

১০. নগেন্দ্রনাথ সোম ; মধুস্মৃতি ; দিতীয় সংস্করণ, পৃ ৮২—৩।

১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ; স্বগত ; প্রথম সিগনেট সংস্করণ, পৃ ৩১।

১২. দীপ্তি ত্রিপাঠী ; আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ; দ্বিতীয় সংস্করণ ; পৃ ২১২।

১৩. আবুল ফজল এই সাদৃশ্যের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ' সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন।

১৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ; 'অর্কেস্টার' ভূমিকা ; কাব্যসংগ্রহ ; প্রথম সংস্করণ, পৃ ৪।

১৫. ঐ ; 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' ; কুলায় ও কালপুরুষ ; প্রথম সিগনেট সংস্করণ ; পৃ ৪১।

১৬. দীপ্তি ত্রিপাঠী ; প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭।

১৭. বুদ্ধদেব বসু ; 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেস্ট্রা' ; কালের পুতুল ; নিউ এজ সংস্করণ ; পৃ ৬৫—৬।

১৮. ঐ ; 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ; ক্রন্দসী' ; ঐ ; পৃ ৬৯।

১৯. অন্তর্যামী ; চিত্রা ; রচনাবলী ৪ ; পৃ ৫৫— ৬।

২০. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ; 'অর্কেস্ট্রার' ভূমিকা ; কাব্যসংগ্রহ, পৃ ৩।

২১. বুদ্ধদেব বসু ; মাইকেল ; সাহিত্যচর্চা।

২২. ঐ ; 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কবি' ; সঙ্গ ঃ নিঃসঙ্গতা ঃ রবীন্দ্রনাথ ; পৃ ৮৬।

২৩. ঐ ; 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ; অর্কেস্ট্রা' ; কালের পুতুল ; পৃ ৬৪।

২৪. সুকুমার সেন ; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; দ্বিতীয় খণ্ড ; তৃতীয় সংস্করণ ; পৃ ১৪৯।

২৫. মধুস্মৃতি ; পৃ ৬১২।

২৬. ঐ ; পৃ ৬২৩।

২৭. বুদ্ধদেব বসু ; 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ক্রন্দসী' ; কালের পুতুল ; পৃ ৬৯।

২৮. ঐ ; 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কবি' ; সঙ্গ ঃ নিঃসঙ্গতা ঃ রবীন্দ্রনাথ ; পৃ ৮৮।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ছিন্নপত্রাবলী ; ১. ১০. ১৮৯১ তারিখের পত্র।

৩০. বুদ্ধদেব বসুর উক্তি স্মর্তব্য ঃ 'তাঁর প্রতিভায় একটি আশ্চর্য সার্বভৌমতা ছিলো—যা কবিদের অনেক সময়েই থাকে না ; সাংসারিক জ্ঞান, সামাজিক আচার নৈপুণ্য, গুণগ্রাহিতা ও সুবিচারবোধ, দৈনন্দিন জীবনে সুশৃংখল বৈভবসাধন, আলাপ, আনন্দ, বন্ধুতা এই সমস্ত বিষয়েই তাঁকে প্রতিবাবান বললে ভুল হয় না।' 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' ; সঙ্গ ঃ নিঃসঙ্গতা ঃ রবীন্দ্রনাথ ; পৃ ৭১।

৩১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ; 'অর্কেস্টা'র ভূমিকা ; পৃ ৮।

৩২. অরুণ ভট্টাচার্য ; কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল, প্রথম সংস্করণ ; পৃ ১১৮।